আঞ্চলিক ইতিহাসে লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতা

সুধীর চক্রবর্তী

আপনাদের কাছে জানানোর কথা এইটাই, যে বিষয়টি নিয়ে বলবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি বলা যায়, যে বিষয়ে আমার বলার কথা, সেই বিষয়ে আমার পুঁথিগত বিদ্যে খুব কম। কিন্তু সরেজমিন অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। আমার বক্তৃতাটা প্রায় সেইদিক দিয়েই যাবে।

আমি একজন পায়ে হাঁটা গবেষক। আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমি সাইকেলটাও চড়তে পারি না। তাই প্রকৃত অর্থে পায়ে হেঁটে গ্রামে ঘুরেছি। আধুনিক কোনো যানের মতো আধুনিক প্রযুক্তিও আমার সঙ্গে থাকে না। একটা টেপ রেকর্ডার বা ক্যামেরাও আমার কাছে থাকত না। আমার এইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এইগুলো থাকলে পরে প্রতিবন্ধকতা আসে। যদি দেখতে পায় আমার কাছে একটা টেপ রেকর্ডার আছে, কেউ অর্ধেক কথা বলবে না। আমার পদ্ধতি ছিল তাদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া। তাদের সঙ্গে বসবাস করা। একসঙ্গে খাওয়া ও তাদের তৈরি করা বিছানাতে শুয়ে পড়া। যেটা সভ্য সমাজের জন্য খুব অনুকূল নয়। তাদের সঙ্গে গান গাওয়া। মেলায় গিয়ে রাত্রি যাপন। সেদিক থেকে আমার মনে হয়, আমার যেটুকু ভিতরকার এই বলবার শক্তি, এই মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া। জ্ঞানবিদ্যার মধ্যে দিয়ে এইটা পাওয়া নয়। আমি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার বিষয়ে আপনাদের কাছে তাত্ত্বিকভাবে কিছু বলবো না। হিস্ট্রিওগ্রাফি নিয়ে আজকাল অনেক চর্চা হচ্ছে, ঐতিহাসিকরা অনেক নতুন তথ্যের আমদানি করেছেন। যার ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাব অলর্টান তত্ত্ব। ইংরেজিতে বলা হয়— History from the bellow। বিদেশে একটা বিখ্যাত গল্প আছে— প্রদর্শনীতে দেখা যাচ্ছে, মৃত বাঘের উপর এক গোঁফওয়ালা শিকারি দৃপ্তভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেটা সবাই দেখে বাহা্ বাহা্ করছে, আর আচমকা একটা জ্যান্ত বাঘও সেই প্রদর্শনীতে ঢুকে পড়ছে। সে ওই ছবিটা দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। তখন সাংবাদিকরা তাকে জিগ্যেস করে, এত হাসার কী আছে? বাঘ উত্তর দেয়, আসলে মানুষ এঁকেছে তো, আমি আঁকলে ছবিটা হতো এইরকম : বাঘের মুখের ভেতর মানুষ ছটফট করছে। এইটে হচ্ছে সাব অলর্টান তত্ত্ব। তেমনই তাজমহল নিয়ে আমরা এত হইচই করি, তাজমহল তৈরি করেছে কারা? খুব সাধারণ মানুষ। কই তাদের কথা তো কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল, কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা আসার সময়, ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর বিরহী বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে যে পেট্রল পাম্প আছে তার সিমেন্টের উপর অনেক লোকের হাতের ছাপ। তলায় লিখে দেওয়া রয়েছে, এইগুলো সেইসব লোকদের হাতের ছাপ, যারা এই পেট্রল পাম্পটা তৈরি করেছে। আমি সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে কোথাও শ্রমিকদের এই স্বীকৃতি দেখিনি। ওই সাধারণ মানুষ, যারা তৈরি করেছে— সেই কারিগরদের হাতের ছাপ ওই সিমেন্টে চিরন্তন হয়ে গেছে। লোকজন আসে তেল ভরে চলে যায়। আমি জিগ্যেস করেছি, কেউ সেদিকে তাকায় না। সুতরাং আঞ্চলিক সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আমাদের অহমিকা, অহংকার আর নাগরিকতা নিয়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছি গাড়ি করে, কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই এইরকম কিছু কিছু জিনিস রয়ে গেছে।

আমি যখন গবেষণা করতে যাই মেহেরপুরে, এখন ভাগ হয়ে বাংলাদেশে পড়েছে—তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। অগম্য জায়গা। পাসপোর্ট নিয়ে যাওয়া যায় না। আর আমার পাসপোর্ট ছিলও না। তবুও আমি সেখানে গেছি। মেহেরপুরে একজন লোক জন্মেছিলেন, তাঁর নাম বলরামচন্দ্র হাড়ি।

তিনি বড় অদ্ভুত লোক। ভালো তীরন্দাজ। গ্রামের জমিদার বাড়িতে কৃষ্ণবিগ্রহ ছিল, তাই তার দারোয়ান হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু একদিন বিগ্রহের সব অলঙ্কার চুরি হয়ে গেল। তখন জমিদার ভাবলেন, যাকে আমরা দারোয়ান হিসেবে রেখেছি, সেই চুরি করেছে। গাছে বেঁধে প্রহার করা হলো। প্রহৃত হয়ে তিনি গ্রাম থেকে চলে গেলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইতে লিখেছেন, দীর্ঘদিন বাদে জটাজুটধারী হয়ে, বলরামচন্দ্র মেহেরপুর গ্রামে আবার ফিরে এলেন। নিজের বাড়িতেই উঠলেন। তারপর একদিন মেহেরপুর সংলগ্ন যে নদী, সেখানে ব্রাহ্মণরা তর্পণ করছেন। বলরামচন্দ্রও তর্পণ করছেন। ব্রাহ্মণরা বলেন, কি রে বলা তুই আবার কাকে জল দিচ্ছিস? আপনারা কাকে জল দিচ্ছেন? আমরা পূর্বপুরুষকে জল দিচ্ছি। বলরামচন্দ্র তখন বলেন, আমি শাকের ক্ষেতে জল দিচ্ছি। আপনাদের জলটা যদি পূর্বপুরুষের কাছে যায় তাহলে আমার জলটা শাকের ক্ষেতে যাচ্ছে।

এই যে প্রতিবাদী চেতনা, আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা করতে গেলে এই মানুষটাকে ধরতে হবে। এই মানুষটাকে ঘিরে বলাহাড়ি সম্প্রদায় বলে একটা সম্প্রদায় তৈরি হয়ে গেল। সেই গ্রামের লোকেরা ব্যাখ্যা করল আমার কাছে, 'হাড়ি' মানে ভাববেন না কোনও নিচু জাত। 'হাড়ি' হচ্ছে যে হাড় তৈরি করেছে। হাড়ের গাঁথুনি চামের ছাউনি। যিনি এই হাড় বানিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন হাড়ি। বলরাম হচ্ছেন সবচেয়ে বড় মানুষ। এইভাবে তারা একটি বিকল্প ইতিহাস তৈরি করল — ওই যে হৈমবতী—যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আর এই হৈমবতীর স্রষ্টা হলেন বলরাম।

তাঁদের মধ্যে থেকে আমি যেটা আবিষ্কার করলাম, বলরামচন্দ্রের প্রথম সৃষ্টি হচ্ছে হৈমবতী আর হৈমবতী থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি। অজস্র বংশধারা ও ইতিহাস—এর ভেতর থেকে বলরাম কৌশলে বুঝিয়ে দিলেন, আপনাদের যে কৌলীন্য তার ভিত্তিতে কিন্তু বলরামচন্দ্র হাড়ি। এই একটা দৃপ্ত প্রতিবাদী ইতিহাস রচনার চেষ্টা আমি লক্ষ্য করলাম তাদের ভেতর। তারা আমাকে বলল, কোনো মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনে আপনাকে আমরা দেবো না। ওরা যে গুড় তৈরি করে তাই দিয়ে, সঙ্গে এক ঘটি জল দিল। বলরামচন্দ্রকে তারা যে মন্ত্র বলে প্রসাদ নিবেদন করছে, সবই বাংলায় লেখা মন্ত্র। তখন যখন লৌকিক বাংলার ভেতর ঘুরছি সেখানে নানারকম সংস্কৃত মন্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখেছি, কিন্তু বলরামচন্দ্রকে পরিষ্কার বাংলায় বলা হচ্ছে—বলরামচন্দ্র তোমাকে চাল-জল দিলাম। তুমি শান্ত হও। তুমি তৃপ্ত হও। ঠিক এই ভাষায়। এরা গান গায় পরিষ্কার ভাষায়। তাতে কোনও তত্ত্ব নেই। বলরামচন্দ্রের নিয়ম হচ্ছে তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও ব্রাহ্মণ থাকবে না। কোনোও পৈতে থাকবে না। থাকবে না কোনো উচ্চবর্ণের মানুষ। সমস্ত ভিন্নবর্গের মানুষ নিয়ে তৈরি করেছিলেন তাঁর দল। রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—'বৃষ্টি নেশা ভরা সন্ধেবেলা কোন বলরামের আমি চেলা'—কুষ্টিয়াতে রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারের কাজে থাকতেন, ওই বলাহাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষদের চাক্ষুষ দেখেছিলেন। একদিন বলরাম বসে আছেন, এক শিষ্য এসে বলল—আমি বিচার চাইতে এসেছি। কিসের বিচার? আমি জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম , তারা বলল প্রণাম কর। আমি বললাম, আমি তো বলরামচন্দ্র ছাড়া কাউকে প্রণাম করি না। তখন আমাকে সবাই মারতে লাগল। মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে, রক্তাক্ত অবস্থায় আমাকে ছেড়ে দিল। আমি মার খেয়ে আপনার কাছে এসেছি। কী করণীয় ছিল আমার? বলরামচন্দ্র বললেন, তোমাকে যদি বাঘ আক্রমণ করত—তুমি কি আমার কাছে বিচার চাইতে? ওই মানুষটাকে তুমি বাঘের মতোই মনে করতে পারতে। এই যে একটা প্রতিবাদী জাতি তৈরি হলো, একটা প্রতিবাদী চেতনা ও সম্পূর্ণ সম্প্রদায় উঠে এল। এদের নিয়ে, একটা গোটা বই আমি লিখেছি : 'বলাহাড়ি সম্প্রদায় ও তাদের গান'।

এই গানগুলি আমিই প্রথম সংগ্রহ করলাম। কেউ তাদের নিয়ে আগে ভাবেনি। ১৮৭২ সালে

অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বই যখন বেরিয়েছিল, বলরামচন্দ্র সম্পর্কে খুব ছোট একটা প্রসঙ্গ ছিল, তাতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে এত তথ্য পাওয়া গেল যে একটা বই হয়ে গেল। বইয়ের মধ্যে সংগৃহীত যতগুলি গান, সবগুলি আমি তাদের কাছ থেকে মৌখিকভাবে সংগ্রহ করেছি। তার কোনো স্বরলিপি নেই; খাতাও নেই। আমার তাদের কথা আজও মনে আছে। বিপ্রদাস ও পূর্ণদাস দুজন মালো সম্প্রদায়ের মানুষ। খোঁজ করতে করতে আমি বিপ্রদাসের বাড়িতে গেলাম। জায়গাটার নাম নিশ্চিন্তিপুর। তেহট্টে নামলাম। বিডিও অফিসে গিয়ে, বিডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললাম যে আমি নিশ্চিন্তিপুর যাব। কোন রাস্তা দিয়ে যাব? তাঁরা বললেন, একদম যাবেন না। ডাকাতদের গ্রাম। আমি বললাম, তাহলে তো যেতেই হয়। বাসে উঠলাম। একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে বলল, এখান থেকে দু-কিমি হেঁটে গেলে নিশ্চিন্তিপুর। আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল বিপ্রদাস হালদার বলে একটা লোক আছে, সেই বলরামের সব গান জানে। তাঁর বাড়ি গিয়ে বললাম : বিপ্রদাস বাড়ি আছেন? তাঁর মেয়ে বেরিয়ে এসে বলল, তিনি বাড়ি নেই। পলাশিপাড়ার হাটে মাছ বিক্রি করতে গেছেন। নদী পেরিয়ে আমি পলাশিপাড়ার হাটে চলে এলাম। বিপ্রদাস বলল, ও আপনি এসে গেছেন। এক কাজ করুন, আপনি আমার বাড়িতে ফিরে যান। ওখানে দাওয়ায় বসে আপনার সঙ্গে কথা হবে। আপনি যান। আমি আসছি। আমি দেখলাম বিপ্রদাসের মাছ তখনও বিক্রি হয়নি। আমি নৌকো করে নদী পেরিয়ে এসে আশ্চর্য হয়ে দেখি, বিপ্রদাস বাড়িতে বসে আছে। আমি বললাম, আমার নৌকোর পরের নৌকোতে এসেছেন নিশ্চয়ই? তাহলে আমার আগে কী করে এলেন? বিপ্রদাস জানালে, জঙ্গলের মধ্যে আমার রণপা ছিল। আমরা তো রণপা ব্যবহার করি। আমি বুঝলাম, নিশ্চিন্তিপুরে ভয়টা কোথায়! লোকটা ডাকাত। গ্রামের এক প্রাইমারি টিচার এসে বললেন, আপনি কলেজে পড়ান। ব্রাহ্মণ সন্তান। চলুন, আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করবেন। আমি বললাম, আমি যে বিপ্রদাসের বাড়িতে এসেছি। বিপ্রদাস বললেন, ওর জ্ঞান উচ্চ হয়েছে। আমার বাড়িতেই খাবেন। কিন্তু আপনার জন্য কারিগর কী পাঠিয়েছে কে জানে? বাড়িতে তো কিছু নেই। এখানে কারিগর মানে বলরামচন্দ্র হাড়ি। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর একটা খ্যাপলা জাল নিয়ে গিয়ে বিপ্রদাস নদীতে ফেললেন। একটা মাছ উঠল। তিনি বললেন, কারিগর এই আপনার জন্য একটা মাছ পাঠিয়েছেন। আহারের পর বললাম, আমি তো গানের জন্য এসেছি। বিপ্রদাস পূর্ণকে ডেকে পাঠালেন। পূর্ণ হালদারের বয়স প্রায় আশি বছর। বিপ্রদাসের বয়সও সত্তর বাহাত্তর। বললেন, কত গান শুনবেন! আমাদের হল গানের গোলাবাড়ি। আমাদের স্মৃতিতে অসংখ্য গান আছে। আপনার টেপ রেকর্ডার শেষ হয়ে যাবে। আমি জানালাম, আমার কাছে টেপ রেকর্ডার নেই এবং গানটা শুনতে চাই। তাঁরা অনেক গান আমাকে শোনাল। সৃষ্টিতত্ত্ব শোনালেন। আমি সেখানে থেকে গেলাম ও সমস্ত গান সংগ্রহ করলাম। সম্পূর্ণ মৌখিকভাবে সংগৃহীত আঞ্চলিক ইতিহাস। এই নিশ্চিন্তিপুরের সঙ্গে মেহেরপুরের একটা লিঙ্ক আছে। কেননা এই মেহেরপুরে বলরাম জন্মেছেন। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মানুষজন চলে এসেছে নিশ্চিন্তিপুরে। এখানে এসে বলরামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কুষ্টিয়ার পাশে বারখেদা বলে একটা অঞ্চল আছে। সেখানে এখনও বলরাম হাড়িরা আছে। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে তারা দেখা করতে আসে।

আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতিক ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। আমরা খেয়াল করিনি। যাদের আমরা উপেক্ষিত বলে মনে করেছি, যে গানগুলিকে আমরা ভদ্র সমাজের উপযুক্ত বলে মনে করি না — আপনাদের জানিয়ে রাখি বলরামচন্দ্র হাড়ি সম্পর্কে যে বই আমি লিখছি, তাতে সমস্ত সংগৃহীত গানগুলি আমি ছেপে দিয়েছি। স্বরলিপিও করে দিয়েছি কিন্তু আজ অবধি কোনও লোকসংস্কৃতির গায়ক বলরামচন্দ্রের গান গেয়েছেন বলে শুনিনি। এখানে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহ-কুষ্টিয়া-ছেঁউরিয়া গিয়েছিলেন, লালন ফকিরের গান সংগ্রহ করেছিলেন। 'বীণাবাদিনী'

পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দিয়ে লালন গীতির স্বরলিপি করিয়েছিলেন। এখনও অবধি নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি ওইটাই যা 'বীণাবাদিনী'-তে ছাপা হয়েছিল। আজকের মানুষ যদি জানতে চায় লালনের গান কেমন ছিল, ওই স্বরলিপিই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় লোকে বলাহাড়ির গান শুনবে বলে আমার স্বরলিপিটা ব্যবহার করবে। তা কিন্তু আশা করা যায় না। আমাদের চোখটা রোগ গ্রস্ত হয়ে গেছে। যেটা দেখবার জিনিস, আমরা সবসময় দেখতে পাই না। এখানে আমার মনে হয়, আঞ্চলিক ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, কত কাজ এর ভেতর হয়নি আমার সেটা বলতে খুব আগ্রহ হয়। যেটা হয়তো এ জীবনে পারলাম না। মানুষের জীবন তো সীমিত। আমি চেষ্টা করেছি তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আমার মতো করে লেখবার। কিন্তু আমার মনে হয়ছে, আমি অনেক কাজ করতে পারিনি। সেরকম কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে বলব। যেমন ধরা যাক, এই যে আমাদের গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে, তাকে নিয়ে আজ অবধি কোনো কাজ হয়নি। গঙ্গার তীরে তীরে যে সব জায়গা আছে সেইগুলো ঘুরে দেখা হয়নি। আমি ঘুরে দেখেছি। আপনাদের কাছে একটা তালিকা পেশ করছি

সেই তালিকা উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে হুগলি হয়ে নদীয়া হয়ে বর্ধমানের দিকে চলে গেলে এই গঙ্গার ধারে ধারে অনেক জনপদ আছে। প্রথমে খড়দা। এটা নিত্যানন্দের জায়গা। আপনি কালনায় আসতে পারেন ওটা বৈষ্ণবদের আখড়া। সেখান থেকে সমুদ্রগড় চলে যেতে পারেন। সমুদ্রগড় পেরোলে নবদ্বীপ নবদ্বীপ পেরিয়ে পাটুলি। আর পাটুলি পেরোলে অগ্রদ্বীপ। এই অগ্রদ্বীপ পেরিয়ে কাটোয়া। এখানে শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা হয়েছিল। সেখান থেকে একটা রাস্তা শ্রীখণ্ডের দিকে চলে গেল। আর একটা রাস্তা জ্ঞানদাস কাঁদড়ার দিকে চলে গেল। মাঝখানে শ্রীনিবাস আচার্যের যাজিগ্রাম। আমি বলতে চাইছি, খড়দা থেকে শ্রীখণ্ড পর্যন্ত বা কাঁদড়া জ্ঞানদাস পর্যন্ত যদি একটা রেখা টানা যায়, গঙ্গার তীরবর্তী একটা অঞ্চল, যে অঞ্চলটা ঘিরে চমৎকার এক আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা যায়। সেটা হল বৈষ্ণবদের ইতিহাস। বৈষ্ণবদের তিনটি শ্রেণী—একটা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এরা সৎ এবং শুদ্ধ বলে নিজেদের মনে করে। এরা শাস্ত্র ও জাত মানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যতই সাম্যের কথা বলুক, এরা অব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষিত হয় না। ব্রাহ্মণের কাছেই অব্রাহ্মণেরা দীক্ষিত হয়। এই হচ্ছে একটা ধারা। এর প্রতিবাদ করে যে ধারাটা তৈরী হল, তা হল জাত বৈষ্ণব ধারা। জাতবৈষ্ণব হল বৈষ্ণবদের থেকে বেরিয়ে আসা একটা প্রতিবাদী হল। যাদের মধ্যে জাতপাতের প্রতি তত অতিভক্তি নেই এবং যদি মেদিনীপুরে যাওয়া যায় দেখা যাবে, সেখানে, জাত বৈষ্ণবদের একটা বিরাট কেন্দ্র আছে। সেখানে শূদ্ররাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশ দিচ্ছে। সব জায়গাতেই এই জাত বৈষ্ণবদের পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়ার উপায় কী? ধরা যাক, অগ্রদ্বীপের মেলা। শোনা যায় প্রায় পাঁচশো বছর ধরে হচ্ছে। এই মেলার যে ইতিহাস তা হল, গোবিন্দদাস বলে এক ব্যক্তি, তিনি শ্রীচৈতন্যের পরিকর ছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য একদিন খেয়ে উঠে বললেন, একটু হরতুকী পেলে ভালো হতো। শুনে তাঁর শিষ্য গ্রাম থেকে হরতুকী এনে দিলেন আর আধখানা রেখে দিলেন। পরদিন অগ্রদ্বীপের কাছে এসে শ্রীচৈতন্য যখন আবার দুপুরবেলার খাবার খেলেন। খাওয়া শেষ হতেই তাঁর শিষ্য তাঁকে হরতুকী দিয়ে বললেন, আগের দিন একটু রেখে দিয়েছিলাম। শ্রীচৈতন্য তাকে বললেন, তোমার তো সঞ্চয় বাসনা যায়নি। তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। তুমি এখানেই থেকে যাও। এখানেই সংসার করো। এখানেই তোমার জীবন কাটুক।

গঙ্গার তীরে অগ্রদ্বীপ। সেখানে সেই শিষ্যের বিবাহের পর সন্তান হল। কিছুদিন পর স্নান করতে গেছেন। পায়ে কী যেন একটা ঠেকল। ভাবলেন শ্মশানের পোড়া কাঠ হবে হয়তো, তারপর দেখলেন পাথরের মতো—সেটা ব্রহ্মশিলা। সেটা নিয়ে গিয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হল। অগ্রদ্বীপের পাশে দাঁইহাট। সেখানে ওই পাথরের মূর্তি তৈরি হয় বহুদিন থেকে। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত কৃষ্ণমূর্তি আছে,

পত্রিকায় ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীকে দিয়ে লালন গীতির স্বরলিপি করিয়েছিলেন। এখনও অবধি নির্ভরযোগ্য স্বরলিপি ওইটাই যা 'বীণাবাদিনী'-তে ছাপা হয়েছিল। আজকের মানুষ যদি জানতে চায় লালনের গান কেমন ছিল, ওই স্বরলিপিই সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় লোকে বলাহাড়ির গান শুনবে বলে আমার স্বরলিপিটা ব্যবহার করবে। তা কিন্তু আশা করা যায় না। আমাদের চোখটা রোগ গ্রস্ত হয়ে গেছে। যেটা দেখবার জিনিস, আমরা সবসময় দেখতে পাই না। এখানে আমার মনে হয়, আঞ্চলিক ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, কত কাজ এর ভেতর হয়নি আমার সেটা বলতে খুব আগ্রহ হয়। যেটা হয়তো এ জীবনে পারলাম না। মানুষের জীবন তো সীমিত। আমি চেষ্টা করেছি তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে আমার মতো করে লেখবার। কিন্তু আমার মনে হয়ছে, আমি অনেক কাজ করতে পারিনি। সেরকম কিছু অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের কাছে বলব। যেমন ধরা যাক, এই যে আমাদের গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে, তাকে নিয়ে আজ অবধি কোনো কাজ হয়নি। গঙ্গার তীরে তীরে যে সব জায়গা আছে সেইগুলো ঘুরে দেখা হয়নি। আমি ঘুরে দেখেছি। আপনাদের কাছে একটা তালিকা পেশ করছি।

সেই তালিকা উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে হুগলি হয়ে নদীয়া হয়ে বর্ধমানের দিকে চলে গেলে এই গঙ্গার ধারে ধারে অনেক জনপদ আছে। প্রথমে খড়দা। এটা নিত্যানন্দের জায়গা। আপনি কালনায় আসতে পারেন। ওটা বৈষ্ণবদের আখড়া। সেখান থেকে সমুদ্রগড় চলে যেতে পারেন। সমুদ্রগড় পেরোলে নবদ্বীপ নবদ্বীপ পেরিয়ে পাটুলি। আর পাটুলি পেরোলে অগ্রদ্বীপ। এই অগ্রদ্বীপ পেরিয়ে কাটোয়া। এখানে শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা হয়েছিল। সেখান থেকে একটা রাস্তা শ্রীখণ্ডের দিকে চলে গেল। আর একটা রাস্তা জ্ঞানদাস কাঁদড়ার দিকে চলে গেল। মাঝখানে শ্রীনিবাস আচার্যের যাজিগ্রাম। আমি বলতে চাইছি, খড়দা থেকে শ্রীখণ্ড পর্যন্ত বা কাঁদড়া জ্ঞানদাস পর্যন্ত যদি একটা রেখা টানা যায়, গঙ্গার তীরবর্তী একটা অঞ্চল, যে অঞ্চলটা ঘিরে চমৎকার এক আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা যায়। সেটা হল বৈষ্ণবদের ইতিহাস। বৈষ্ণবদের তিনটি শ্রেণী—একটা হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব। এরা সৎ এবং শুদ্ধ বলে নিজেদের মনে করে। এরা শাস্ত্র ও জাত মানে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যতই সাম্যের কথা বলুক, এরা অব্রাহ্মণের কাছে দীক্ষিত হয় না। ব্রাহ্মণের কাছেই অব্রাহ্মণেরা দীক্ষিত হয়। এই হচ্ছে একটা ধারা। এর প্রতিবাদ করে যে ধারাটা তৈরী হল, তা হল জাত বৈষ্ণব ধারা। জাতবৈষ্ণব হল বৈষ্ণবদের থেকে বেরিয়ে আসা একটা প্রতিবাদী হল। যাদের মধ্যে জাতপাতের প্রতি তত অতিভক্তি নেই এবং যদি মেদিনীপুরে যাওয়া যায় দেখা যাবে, সেখানে, জাত বৈষ্ণবদের একটা বিরাট কেন্দ্র আছে। সেখানে শূদ্ররাই ব্রাহ্মণদের নির্দেশ দিচ্ছে। সব জায়গাতেই এই জাত বৈষ্ণবদের পাওয়া যায়। কিন্তু পাওয়ার উপায় কী? ধরা যাক, অগ্রদ্বীপের মেলা। শোনা যায় প্রায় পাঁচশো বছর ধরে হচ্ছে। এই মেলার যে ইতিহাস তা হল, গোবিন্দদাস বলে এক ব্যক্তি, তিনি শ্রীচৈতন্যের পরিকর ছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন পরিক্রমায় বেরিয়ে ছিলেন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শ্রীচৈতন্য একদিন খেয়ে উঠে বললেন, একটু হরতুকী পেলে ভালো হতো। শুনে তাঁর শিষ্য গ্রাম থেকে হরতুকী এনে দিলেন আর আধখানা রেখে দিলেন। পরদিন অগ্রদ্বীপের কাছে এসে শ্রীচৈতন্য যখন আবার দুপুরবেলার খাবার খেলেন। খাওয়া শেষ হতেই তাঁর শিষ্য তাঁকে হরতুকী দিয়ে বললেন, আগের দিন একটু রেখে দিয়েছিলাম। শ্রীচৈতন্য তাকে বললেন, তোমার তো সঞ্চয় বাসনা যায়নি। তোমার আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। তুমি এখানেই থেকে যাও। এখানেই সংসার করো। এখানেই তোমার জীবন কাটুক।

গঙ্গার তীরে অগ্রদ্বীপ। সেখানে সেই শিষ্যের বিবাহের পর সন্তান হল। কিছুদিন পর স্নান করতে গেছেন। পায়ে কী যেন একটা ঠেকল। ভাবলেন শ্মশানের পোড়া কাঠ হবে হয়তো, তারপর দেখলেন পাথরের মতো—সেটা ব্রহ্মশিলা। সেটা নিয়ে গিয়ে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হল। অগ্রদ্বীপের পাশে দাঁইহাট। সেখানে ওই পাথরের মূর্তি তৈরি হয় বহুদিন থেকে। সারা পশ্চিমবঙ্গে যত কৃষ্ণমূর্তি আছে,

লম্বা। চিবোতে চিবোতে জল পাওয়া যায়। মধ্যে একটা লোক তালের রস বিক্রি করছে। এক গ্লাস খেয়ে নিলে, হাঁটতে পারা যায়। আমি তপ্ত বালুর ওপর দিয়ে হাঁটছি। চৈত্র মাস। অগ্রদ্বীপ যখন পৌঁছলাম, আমার সঙ্গে অজস্র লোক কিন্তু যাচ্ছে। চলেছেই। আমি ওখানে গিয়ে সমীক্ষা করলাম। যারা এসেছে সেই আখড়াগুলোতে সব গেলাম। গিয়ে বললাম, আপনারা কোথা থেকে আসছেন? সব কাগজে টুকতে থাকলাম। কোন কোন অঞ্চল থেকে তারা আসছে। আমি জানতে চাইলাম, আচ্ছা এত জায়গা থাকতে আপনারা এই নবদ্বীপের চারপাশে এলেন কেন? এই নবদ্বীপ এই পাটুলি এই যে অগ্রদ্বীপ—এইসব জায়গায় এত উদ্বাস্তু কেন? বলল, এত উদ্বাস্তু কেন জানেন? আসলে যখন আসতেই হবে তখন আমরা ভাবলাম, গৌর-গঙ্গার দেশে যাই। গৌর-গঙ্গা কেন জানেন? পূর্ব্ববঙ্গে গৌরও নেই আর গঙ্গাও নেই। এখানে দুই আছে। কাজেই একজন নিম্নস্তরের যে সাধারণ মানুষ, ভক্ত মানুষ তারা কিন্তু অগ্রদ্বীপকে মহিমার দিক থেকে, একটা দিক দিয়েই জানে যে — গৌর-গঙ্গার দেশ। একই সঙ্গে গৌরকেও পাব আবার গঙ্গাস্নানও করব।

এখানকার ইনফ্রাসস্ট্রাক্চার যদি দেখেন অবাক হয়ে যাবেন। অগ্রদ্বীপে যারা যায় গোরুর গাড়ি করে যায়। যেত বললেই ভালো হয়, এখন আর গোরুর গাড়ি যায় না। আগে দেখতাম, কাঠ-খড় পাটকাঠি নিয়ে যাচ্ছে। অড়হর গাছের ডাল পালা নিয়ে যাচ্ছে। অড়হরের ডাল পালা লম্বা লম্বা হয়। সেটা শুকনো নিয়ে যাচ্ছে। তারপর মাটি খুঁড়ছে। রান্না করছে। মাটি খুঁড়ে কোথাও ডাল রাখছে। ভাত রাখছে। কারণ রাঢ়ের মাটি পাথরের মতো শক্ত। আমি দিনের পর দিন খেয়েছি। কখনও রোগের আক্রমণ হয়নি। এটা নদীয়া বা বর্ধমানে পাওয়া যাবে কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় হবে না। কাদা মিশে যাবে। তুলনায় অগ্রদ্বীপের মাটি হচ্ছে একবারে ইট। আমার তখন ফুল্লরায় বারোমাস্যার কথা মনে পড়ল যে 'আমানি খাবার গর্ত দ্যাখো বিদ্যমান'। সে বলেছিল আমাদের বাসনপত্র তো কিছু